The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ভাষা-আন্দোলনের উপন্যাসে নারীর ভূমিকা

[Role of Women in the Language Movement Novels]

Dr. Sumaiya Khanom
Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 26 February 2025
Received in revised: 08 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
ভাষা-আন্দোলন, উপন্যাস, নারী-শিক্ষা, প্রতিবাদী নারী, আগামীর জাগরণ

ABSTRACT

Acquiring a linguistic and cultural heritage is absolutely essential for human existence. Language is vital for fulfilling basic human needs and its related concerns. In order to subjugate a nation, one must destroy the rights of its language and culture. After the partition of India in 1947, East Bengal came under the affiliation of West Pakistan. However, the ruling class at that time were unwilling to grant the language of the majority of East Bengal the status of the state language. Consequently, Bengali people got involved in the language movement starting in 1948. During the struggle from 1948 to 1952, Bengalis had to face extreme conditions such as oppression, torture in prison and even suicide. The martyrdom of Salam, Rafiq, Barkat, Jabbar in establishing the status of the mother tongue on 21st February 1952 is a prominent chapter in our history. Alongside them, Bengali women also actively participated in the movement at that time, as history bears its witness. Our literature and culture have been persistently containing the multi-dimensional impact of Bengali's emotions, struggles and sacrifices for their mother tongue. The evidence of the role of women in the language movement is also found in stories and novels. Women also played important roles in marches, meetings, setting up posters, writing banners, holding gatherings and violating Article 144. Dhaka University student G.M. Dr. Safia Khatun was the first person to break Article 144. Other protesting women were - Raoshan Ara, Sara, Taifur, Suraiya Dolly, Mumtaz Begum, Sufia Kamal, Rahela, Rahima, Saleha Begum, Dil Manoara Manu, Lily Chakraborty, Sufia Ibrahim, etc. And the image of these resilient women is portrayed in the language-movement novels too. Female characters such as Nargis, Jyotsna, Faria in Zahirul Islam's novel *Agnisakshi* (1969); Beena in Selina Hossain's (born 1947) novel *Nirontor Ghonta Dhoni* (1985); Anjum in the novel Japito Jibon; Sitara in Shawkat Osman's (1917-1998) novel *Artonad* (1985); have been depicted as the inspiring figures who have outspokenly protested in the language movement. These characters have transcended the passage of time and generated inspiration for women's awakening from generation after generation. I believe that this generation, carrying the strength of these characters, will play a role in the formation of society and the state.

১. ভূমিকা

বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা-আন্দোলন একটি প্রাতিস্বিক মাইলফলক। বাংলাদেশ বাঙালির ধাত্রিমাতা আর বাংলা ভাষা বাঙালির আত্মীকৃত বচন। এই দুয়ের মুক্তি বাঙালির আত্মানুভবজাত উৎকণ্ঠার আশ্রয়স্থল। সাহসী বাঙালি জাতি এ দুয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিজয়ী বীর। বিদ্বৎসমাজ বাঙালির এই জাতীয় ইতিহাসকে সাহিত্যের বাতাবরণে আবদ্ধ করেছে। সুবিন্যাস্ত শিল্পনির্মিতিতে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছে উপন্যাস-সাহিত্য। আর এই উপন্যাসের অবয়বে ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেয়া নারীর ভূমিকাকে স্পষ্ট করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধের আলোচনায় ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেয়া নারীদের নানান্ কর্মকাণ্ড উল্লেখসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার ভাবব্যাখ্যাসূত্র আগামী প্রজন্মের জন্য লেখক নব্য জীবনবোধের ঝাণ্ডা বহন করবে এবং চেতনা জাগরণের প্রেরণায় আগামী নারীদের দীপিত করবে।

২. পেডাগোজির (Pedagogy) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি। পেডাগোজিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. শারীরিক (Physical)
২. বুদ্ধিবৃত্তিক (Intelectual)
৩. নৈতিক (Moral)
৪. জাতীয়তাবাদী (Nationality)
৫. তাত্ত্বিক (Theoritical) এবং
৬. মানবিক (Humanitarian)[১]

৩. এবারে আমরা ভাষা-আন্দোলনের উপন্যাসে নারীর ভূমিকা কতটা ও কীভাবে এসেছে সে বিষয়ে আলোচনার বিস্তারে যাবো। এসব উপন্যাসে পেডাগোজি কীভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। উপন্যাসগুলো–

১. জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯)
২. জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯)
৩. সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৫), *যাপিত জীবন* (১৯৮১)
৪. শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *আর্তনাদ* (১৯৮৫)
৫. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (জ. ১৯৩২) রচিত *আলো আমার আলো* (১৯৯০)

৩.১. প্রথমে আমরা *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের কথা বলতে চাই।

ভাষা-আন্দোলন এই Concept-ই নারীবাদী Concept. কেন না এখানে বলা হয় 'মায়ের মুখের ভাষা' হরণ, 'মা' অর্থাৎ দেশমাতৃকা। দেশকে মায়ের সাথে তুলনা করা হয়। নারী মাতৃত্ব, কোমলতা, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার প্রতীক।

আত্মীকৃত অনুভূতি, সময়দ্রষ্টা, তীক্ষ্ণ মনন দ্বারা জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) রচনা করেছেন *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯)। বাস্তবতা ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় অনবদ্য এক সৃষ্টি এই উপন্যাস। এই উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশে উপন্যাসের অঙ্গনে জহির রায়হান এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নাম। তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে গঠন করেছেন উপন্যাসের অবয়ব। ইতিহাস সম্পর্কিত উপন্যাসে তিনি সার্থক রস সঞ্জীবিত করেছেন। যার অন্যতম উদাহরণ *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাস। উপন্যাসটির মূল কাহিনি মূলত ভাষা-আন্দোলন। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যেসকল তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে সেই আন্দোলনকে পুনরায় তরান্বিত করা বা প্রতিষ্ঠিত করা উপন্যাসের মূল বক্তব্য। চিত্রনির্মাতা, কথাশিল্পী, রাজনীতিবিদ সর্বোপরি যুগদ্রষ্টা এই লেখক এখানে জাতীয় জীবন ও শিল্পের এক সমন্বয় ঘটিয়েছেন। লেখক জহির রায়হান ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং কারাবরণ করেন।'[২] মানুষের অবরুদ্ধ ক্ষোভ, ক্রোধ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর আত্মদানের বিরল ঘটনা দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তাই *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের পরতে পরতে সেই ইতিহাসচেতনা জারিত করেছেন শৈল্পিক নৈপুণ্যে। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির প্রস্তুতি, সরকারি বাধা ও ছাত্রসংগ্রামের যে চিত্র, তারই সন্নিবেশ *আরেক ফাল্গুন*।

এই উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেয়া সক্রিয় অনেকগুলো নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা হলো রানু, বেণু, নীলা, সালমা, শাহানা ও ডলি। উল্লেখিত নামচরিত্র ছাড়াও অনেক ছাত্রির অংশগ্রহণে আন্দোলন সফলতা পেয়েছে সে কথাও আমরা উপন্যাসের বর্ণনায় পাই। মেডিকেল কলেজের ছাত্রি, ইডেন কলেজের ছাত্রি, কামরুন্নেসা কলেজের ছাত্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রিদের ভাষা-আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন জহির রায়হান। এসকল নারী নানাভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। উপন্যাসে উল্লেখ আছে- মিটিং, মিছিল, দেয়াল পত্রিকা লেখা, প্লাকার্ড ও ফেস্টুন তৈরি, ভাষা-শহীদদের জন্য রোজা রাখা, খালি পায়ে হেঁটে তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, সংগ্রামী স্লোগান দেয়া, গণজাগরণের গান গাওয়া, কালো শাড়ি পরিধান করা এবং সর্বোপরি কারাবরণ করা। এভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণে উন্মাতাল ছিল একুশের প্রেক্ষাপট। ইতিহাস থেকে জানা যায় লালবাগ থানায় ২২জন মেয়েসহ ২১৫ জনকে গ্রেফেতার করা হয়।'[৩] এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য ১৯৫৫ সালে ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং গ্রেফতার। সরাসরি নারীর এই অংশগ্রহণ পেডাগোজির প্রথম ধারায় অর্থাৎ শরীরবৃত্তিক শিক্ষাধারার অন্তর্ভূক্ত।

নয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের উৎসর্গপত্রের কথা বলতেই হয়। সেখানে লেখক বলেছেন:

> এদেশের মানুষের মুখের ভাষাকে
> কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে
> যাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

যাঁরা পুলিশের লাঠি গুলি আর
বেয়োনেটকে উপেক্ষা করে মিছিলে
এগিয়ে এসেছেন।
যাঁরা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে
গিয়ে কারাগারে অমানুষিক
নির্যাতন ভোগ করেছেন
যাঁরা শৈরাচারের বিষাক্ত ছোবলের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার আন্দোলনকে
এগিয়ে নিয়ে গেছেন
আর,
আর যাঁরা মিছিলে, কারাগারে, ক্ষেতে,
খামারে, কারখানায় এই
আন্দোলনের বাতাস বহন করতে
গিয়ে তাদের অমূল্য জীবন বিসর্জন
দিয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন
তাঁদের সকলকে।[৪]

এখানে উপন্যাসের সূত্র গ্রথিত। এবার আমরা উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনে নারীর ভূমিকা তুলে আনতে চেষ্টা করবো। উপন্যাসের শুরুতেই বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছিলো তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫৫তে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রিদের খালি পায়ের যাত্রার ঐতিহাসিকতা নিয়ে এগুনোর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে এ যাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণ স্পষ্ট। এখানে রানু, বেণু আর নীলার খালি পায়ে মিছিলে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি লেখক দৃঢ় করেছেন। উপন্যাসের উক্তি:

জুতোবিহীন তিনজোড়া পা সমতালে মাটিতে ফেলছিলো তারা, আর এগিয়ে আসছিলো নগ্ন পায়ে শিশির মেখে।
ওরা ছিলো তিনজন।
রানু বেণু আর নীলা।[৫]

এই নগ্ন পায়ের যাত্রায় যোগ দিয়েছে ইডেন কলেজ ও কামরুন্নেছা কলেজের ছাত্রিরাও। তাই বলা যায় এখানে নারীর ভূমিকা স্পষ্ট। এই যাত্রার সাথে উপন্যাসের যাত্রার শুরু হয়। প্রথম অধ্যায় থেকে কাহিনি প্রবহমানতা পায়। উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে ফ্ল্যাশব্যাকে ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের কথা এসেছে। সেখানে মুহুর্মুহু গুলি, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিলো বাঙালিদের। ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নারীর এগিয়ে আসার চিত্র মুনিমের চোখে ভাসে। তার বর্ণনায়, 'কাকডাকা ভোর না হতে সেদিন দলে দলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিলো। মেডিকেল কলেজের পুরনো হোস্টেলে। ছেলে। বুড়া। মেয়ে।'[৬] তারা প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছিলো বাংলা ভাষার অধিকার।

এদের সাথে যোগ দেয় মেডিকেল পড়ুয়া সালমা। দৃঢ়তা ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সালমার চরিত্রে অঙ্কন করেছেন লেখক। সালমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, 'নীলার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে চাপা অথচ তীব্র গলায় বলল ভয়? বলতে গিয়ে দুচোখে আগুন ঠিকরে আগুন বেরুলো, আর পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সালমা। আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল আমার স্বামী জেলে। ভাই জেলে। ছোট বোনটিও আমার জেলখানায়, আমার ভয় করার মতো কিছু আছে?'[৭] ছাত্রীদরে এই চেতনা পেডাগোজির চতুর্থ ধারার জাতীয়তাবাদী শিক্ষার দিকনির্দেশনা দেয়।

উপন্যাসে পঞ্চম অধ্যায়ে নারীরা আন্দোলনে বেশ সক্রিয়। এই অধ্যায়ে মেয়েরা হোস্টেলে লুকিয়ে পোস্টার ও দেয়াল পত্রিকা লিখেছে। সরাসরি আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। কাঁদুনে গ্যাসে অজ্ঞান হয়েছে। শহীদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েরা রোজা রেখেছে। কালো ব্যাজ পরা ব্যান করায় মেয়েরা কালো শাড়ি পরে প্রতিবাদে জানিয়েছে। আন্দোলনে নার্সরাও অংশগ্রহণ করেছে। এই অধ্যায়টি নারীর অংশগ্রহণ ইতিহাস প্রকাশের গুরুত্ব বহন করে। নিম্নে উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায় থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

১. দরজায় খিল দাও। ম্যাচেশটা কোথায়। আহ! শব্দ করো না, সুপার জেগে যাবে। টেবিল চেয়ারগুলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে মসৃণ মেঝের ওপর গোল হয়ে বসলো ওরা।
বাইরে রাত বাড়ছে।
মোমবাতির মৃদু আলোয় বসে দেয়াল পত্রিকাগুলো লিখছে ওরা।

২. কাঁদুনে গ্যাসের অকৃপণ ধারা তখনও বর্ষিত হয়ে চলছে। একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো বেলতলায়। দুটি মেয়ে ছুটে এসে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে এলো তাকে।
৩. ...চাপা গলায় আবার বলল আজকে তোমরা রোজা রাখো নি?
৪. কালো ব্যাজ পরা ব্যান করেছো। আর তাই আমরা কালো শাড়ি পরেছি। দেখি, ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যান করে কিনা। (ইতিহাস)

এই বিষয়গুলোকে নৈতিক শিক্ষার আওতায় আনা হয় যা পেডাগোজির ৩ নম্বর ধারার অন্তর্ভূক্ত।

এরপর থেকে উপন্যাসটি চরম উৎকর্ষের দিকে এগুতে থাকে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরকার যখন মিটিং, মিছিল, স্লোগানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলো তখন আপামর ছাত্র-ছাত্রিরা যে যার হলের ছাদ থেকে চিৎকার করে স্লোগান দিতে থাকে। এখানেও নারীরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। এখানে বিষয়টি সরাসরি রাজনৈতিক শিক্ষার দিক নির্দেশনা দেয়। উপন্যাসে একুশ ও ভাষা-আন্দোলনের পারিপার্শ্বিকতা অনুরণণ তুলেছে। লেখক মাত্রই দৃশ্যদ্রষ্টা হন। জহির রায়হান সম্পর্কে বলা হয়, 'জহির রায়হান সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র কথাসাহিত্যিক যার উদ্ভবের পেছনে আছে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও দ্রোহ।'[৮] এই ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে যেয়ে বাঙালির সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন তিনি। উপন্যাসে গানের ব্যাবহার বাঙালির সাংস্কৃতিক ঝাণ্ডাকে উড্ডায়মান রাখার প্রয়াস বলে মনে হয়। আন্দোলনকারীরা গাইছে:

১. ভুলবো না ভুলবোনা একুশে ফেব্রুয়ারি (উপন্যাসের পৃষ্ঠা নম্বর ৫১)
২. ওদের ভুলতে পারি না ভুলি নাই রে (পৃ. ৫৬)
৩. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে (পৃ. ৬৮)
৪. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। (পৃ. ৬৮)

অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে ক্লাইম্যাক্স পরিলক্ষিত হয়। এই দুই অধ্যায়েই নারীর ভূমিকা ভীষণ সক্রিয়। এখানে নারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করছে। 'বরকতের খুন ভুলবো না শহীদের খুন ভুলবো না বলে স্লোগান দিচ্ছে।'[৯] এসব শ্লোগান ঐতিহাসিক সত্যতা বহন করে।[১০] তারপর গ্রেফতার হচ্ছে–

> সালমা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ক'জন।
> নীলা জবাব দিলো, পাঁচ।
> তাহলে পাঁচ আর আট মিলে আমরা তেরোজন হলাম।
> হ্যাঁ, তেরোজন মেয়ে আমরা। সালমা বললো।[১১]

এভাবেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধে বাংলার নারীরাও সমান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আসছে ফাল্গুনে প্রতিবাদী সত্তা নিয়ে দ্বিগুণ হতে চেয়েছে তারা। বিষয়টি আগামী প্রজন্মের জন্য প্রেরণাস্বরূপ।

৩.২. এবারে আলোচ্য জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯)। উপন্যাসের বক্তব্য যদিও গণ-আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়েছে তথাপি ভাষার জন্য ছাত্র-ছাত্রিদের যে সংগ্রাম, যে ত্যাগ তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ৬৯-এর সংগ্রামমুখর উপন্যাস এটি। ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের উদ্দীপনা নিয়ে মুনির, নার্গিস, মধুরিনা, বুলন, দীপক ৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ছাত্র-আন্দোলন ও একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়াকে একসাথে মিশিয়ে লেখক এক বিশেষ উপন্যাস হিসেবে *অগ্নিসাক্ষী*কে দাঁড় করিয়েছেন। *অগ্নিসাক্ষী* ভাষা-আন্দোলনের চেতনাপ্রসূত। উপন্যাসের শেষে কিছু লাইনে উপন্যাসের মূল বক্তব্য প্রতিয়মান। উপন্যাসের শেষাংশে সকলেই ভাষাশহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের প্রতিবাদ আরো বেগবান করেছে। বলেছে:

> শহীদ জব্বার, বরকত, সালাম
> লাল সালাম লাল সালাম।
> মধুরিমা সংকোচ হারালো, নির্বিকার চেতনাটাকে নির্মূল করে একটা পূর্ণ অনুভূতির আস্বাদ পেলো।
> তারপর ক্রমশ হাইকোর্ট পেরিয়ে মেডিকেল কলেজকে বাইরে রেখে বাহান্ন সালের শহীদ মিনারে গিয়ে হাজির হলো।[১২]

এই উপন্যাসে নার্গিস, মধুরিনা সংগ্রামী ও প্রতিবাদী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। লেখক মধুরিনাাকে আমাদের সাথে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, 'মধুরিনা তার চিরচেনা পৃথিবী থেকে আড়াল হতে চায় না। এই সমাজে এই উঁচু-নিচু আর্থিক অবস্থানের চোরাবালিতে কঠোর সংগ্রাম করে বাঁচতে চাই।'[১৩] এখানে পেডাগোজির সামাজিক শিক্ষা ধারাটি অনুসৃত। উপন্যাসে মধুরিনা ছাড়াও আন্দোলনে অন্যান্য মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র বারবারই আমাদের সামনে উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, 'মিছিলটা দেখতে দেখতেই এগুলো। বেশ কিছু মেয়েও রয়েছে মিছিলের পুরোভাগে। তাদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে মধুরিনা।'[১৪]

৩.৩. সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) ভাষা-আন্দোলন নিয়ে দুইটি উপন্যাস পাওয়া যায়। *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* ও *যাপিত জীবন*। *নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি* উপন্যাসের একটি জায়গায় ভাষা-সংগ্রামে নারীসমাজের অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত মেলে। মিছিল, মিটিংয়ে নারীদের অংশগ্রহণের দৃশ্য পূর্বে আমরা দেখেছি। তবে এখানে নতুন যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় সেটি হলো ৫২-র আন্দোলনে ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বর্জন করে। বিয়টির উপস্থাপনে এই উপন্যাসে এসেছে, '২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে।'[১৫] এই বিষয়টি মানবিক শিক্ষার প্রেরণা দেয়।

৩.৪. সেলিনা হোসেনের রচিত ভাষা-আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল উপন্যাস *যাপিত জীবন* (১৯৮১)। ভাষার জন্য লড়াইয়ের বীজ রোপিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে। চার বছর পথ পরিক্রমা শেষে সে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ১৯৫২ সালে।[১৬] সর্বস্তরের বাঙালির স্বশরীরে সংগ্রাম ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক দলিলে মোড়া এই উপন্যাসটি।[১৭] এর প্রেক্ষাপট ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ৫২-র ভাষা-আন্দোলন। স্বভাবতই অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এখানে নারীর ভূমিকা স্বপ্রতিভ। উপন্যাসে আঞ্জুম একটি সক্রিয় চরিত্র। এর পাশাপাশি ৫২-র মিছিল, মিটিং, পোস্টার লিখন, ব্যানার তৈরি তার প্রচার সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতির চিত্র এই উপন্যাসেও দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এসকল কাজের ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে।[১৮]

উপন্যাসের বর্ণনা ও শব্দচয়ন শৈল্পিক নৈপুণ্যে ব্যঞ্জনাবহ। এখানে নর-নারীর প্রেম ও একুশের আন্দোলন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনাধারী। আঞ্জুম জাফরের প্রেমে প্রতিবাদমুখর। উপন্যাসে আঞ্জুম জাফরকে নানা নামে আখ্যায়িত করেছে। যেমন- চকখড়ি, শীতের বেলা, বাটখারা, মধুমাস, বসন্ত, কৃষ্ণচূড়া, ফুলের বন, ঘুমপাড়ানি গান, স্বপ্ন, চোখের জল, ঘোড়ার ডিম, মিছিল, স্বদেশ, হৃদয়ের বারুদ ইত্যাদি। এখানে একুশের আন্দোলনের প্রতীকায়নে মধুমাস, কৃষ্ণচূড়া, স্বদেশ, মিছিল, হৃদয়ের বারুদ ইত্যাদি নাম অঙ্কিত। শব্দগুলোর ব্যবহার পাঠকের হৃদয়ে বিদ্রোহী দ্যোতনা জাগায়। একইসাথে আরও আমরা উল্লেখ করতে পারি আঞ্জুম জাফরের কথোপকথন। যেখানে ভাষা-আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের দিকনির্দেশনা মেলে:

> ভাষার প্রশ্নে ওদের অযৌক্তিক দাবি আমি একদম সহ্য করতে পারছি না।
> এটা আমারও মনের কথা আঞ্জুম। ভেবেছে বাঙালি মাথা তুলবে না, তুলবে কি না টের পাবে।
> ঠিক। আমিও তোমার সঙ্গে আছি।[১৯]

উপন্যাসে আরো দেখা যায় ভাষা-আন্দোলনে ছাত্রিরা অংশগ্রহণ করায় তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই উল্লেখ থেকেও নারীর অংশগ্রহণ স্পষ্ট হয়। উপন্যাসের বক্তব্য, 'ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং সাতাশ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ছয় জনকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।'[২০] দেশের জন্য এই ত্যাগ দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটায়।

উপন্যাসের শেষপ্রান্তে নারীর অংশগ্রহণে প্রাঞ্জল হয়েছে আন্দোলনের প্রান্তর। ভাষার অধিকার অর্জনই ছিল তাদের একক লক্ষ্য। সেখানে লেখক বলেছেন: 'অসংখ্য ছেলেমেয়ে গ্রেফতার করার পরও অনিঃশেষ। ছাত্র-ছাত্রীরা ধীরে ধীরে মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট দিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে জমায়েত হতে থাকে।'[২১] এই চেতনা জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ তোলে। এভাবে সেলিনা হোসেনের দুটি উপন্যাস থেকেই ভাষা-আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্রল দৃশ্য প্রতিয়মান হয়।

৩.৫. ইতিহাসজ্ঞান, সমাজ-অভিজ্ঞতা, বস্তুময় জীবনদৃষ্টি, স্বদেশ ও সমকাল সচেতনতা ও মুক্তজীবনবাদী সাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। বিভাগোত্তর বাংলা কথাসহিত্যে ভাষা-আন্দোলনের প্লটকে যাঁরা প্রাধান্য দিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান ও তাঁর *আর্তনাদ* (১৯৮৫) উপন্যাসটি বিশেষতম। জাতীয় ইতিহাসের কোন মহৎ অধ্যায়কে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে গেলে লেখকের দায়িত্বের পরিধি বহুগুণে বেড়ে যায়। দায়িত্ববোধে শওকত ওসমান ছিলেন সচেতন। ভাষা-আন্দোলনের মতো জাতীয় ইতিহাসকে তিনি তুলে ধরেছেন *আর্তনাদ* উপন্যাসের পাতায় পাতায় জাফর, নগীবউদ্দিন, সালামত আলী প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জাতীয় চেতনা থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রেরণা তাঁকে ছুঁয়ে গিয়েছিল, সেই প্রেরণাতেই কিছুটা প্রতীকী চরিত্রের আদলে *আর্তনাদ* ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে।

আর্তনাদ উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেয়া নারীর কথা উল্লেখ না থাকলেও মায়ের মুখের ভাষা বাংলা এই প্রতীকায়নে উক্তি এসেছে। সন্তানহারা বৃদ্ধ পিতার আর্তনাদে বাঙালি নারীর ওপর অত্যাচারের কথা উঠে আসে। 'একাকী' শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা পাই, 'এত রক্ত, জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত ছিল আমাদের শীর্ণ শরীরে।'[২২]

৩.৬. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (জ. ১৯৩২) রচিত *আলো আমার আলো* (১৯৯০) ভাষা-আন্দোলনপ্রসূত বিশেষ এক উপন্যাস। উৎসর্গপত্রে গ্রন্থাকারের বক্তব্যে এই বিষয়টির অস্পষ্টতা দূর হতে পারে, 'ভাষা-আন্দোলনের সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।'[২৩] উপন্যাসের কাহিনি ১২টি অধ্যায়ের সন্নিবেশিত হয়েছে। ১২ অধ্যায়ের সূচনা, গ্রন্থিমোচন, প্লট উন্মোচন,

উৎকর্ষতা, দ্বন্দ-জটিলতা থেকে পরিণতির দিকে এগুনো এবং উপসংহার সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত। উপন্যাসের নায়কের বক্তব্য অনুসারে ঐতিহাসিক দু একটি চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও কাহিনি কাল্পণিক। তবে ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল *আলো আমার আলো* উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনকেই প্রকাশ করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন ছাত্রসমাজকে কীভাবে বিদ্রোহী করে তুলেছিল এবং কীভাবে বিপক্ষ শক্তি তাদের রুখবার চেষ্টা করেছিল, আন্দোলন ও জীবনের বিনিময়ে কীভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালি জাতি, তারই স্মারকস্তম্ভএই উপন্যাসটি। ভাষা-আন্দোলনে স্বজন হারানোর স্মৃতি বুকে নিয়ে শহীদআত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারে ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন যাওয়া এবং সেখানে শহীদের আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যেন বাঙালি-চেতনার নির্ভেজাল প্রাপ্তি। আর এই প্রাপ্তি-সংযোগ ঘটেছিল এই উপন্যাসের নায়ক কামালের। সে শহিদ মিনারপ্রাঙ্গণ থেকে হারিয়েছিল তার প্রেমিকা আলোকে। তার উক্তি: 'তিরিশ বছর আগের কথা। মনে হয় এইতো সেদিন। সেই সপ্তদশী আলোকে দেখলাম। এখানেই একদিন হারিয়ে গিয়েছিল আলো।'[২৪]

আলো আমার আলো উপন্যাসে নিজস্ব চিন্তনের বহুবর্ণিল রেখা টেনেছেন লেখক। সেখানে ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেয়া সকল বাঙালির রেখাচিত্র অঙ্কনে নারীর অংশগ্রহণকে তুলে এনেছেন। চয়িত অক্ষরবিন্যাসে বিভূষিত করেছেন উপন্যাসের নায়িকাকে। তার কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়েছেন, 'আপনি কি মেয়েদের খুব দুর্বল ভাবেন নাকি।'[২৫] একই অধ্যায় নায়িকা আলোকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি কি মনে করেন শাহেদ ভাই, বাঙ্গালী মেয়েরা আজও সেই ললিতলবঙ্গলতাটি হয়ে আছে।'[২৬] উপন্যাসে শাহেদ এবং আলো ভাষাসংগ্রামী। আলো সংগ্রামে প্রদীপ্ত, উদ্দীপ্ত। সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সচেতন মেয়ে। উপন্যাসে আলোর পাশাপাশি অন্যান্য নারীর উপস্থিতি ভাষা-আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণকে স্পষ্ট করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন মিছিলে অংশ নেয়া বেবি, রেখা, বিথীর উপস্থিতি বিষয়টিকে আরো দৃঢ় করে। এরই পাশাপাশি উপন্যাসে উল্লেখ আছে, 'কিছুক্ষণ পরে বেশ কয়েকজন মেয়েও এলো ওরা সম্ভবত ইডেন কলেজের ছাত্রী হবে।'[২৭] এরা সকলেই ভাষা-আন্দোলনে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে এসেছে সাহসিকতার সাথে।

আবদুল আউয়ালের *আলো আমার আলো* উপন্যাসে একুশের চেতনা, সংগ্রাম এবং আন্দোলন-পরবর্তী একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের চিত্র ভাস্বর হয়েছে। উপন্যাসে ইতিহাস যেমন এসেছে তেমনি এসেছে একুশে আপামর জনতার অংশগ্রহণ। মিটিং, মিছিল, বক্তৃতা, ১৪৪ ধারা, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, গুলি, মৃত্যু, লাশ গুম। উপন্যাসে লঞ্চডুবিতে আলোর মৃত্যু হলেও শাহেদ কামালের চেতনায় আলো স্থির। তাইতো হারিয়ে যাওয়া আলোকে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন শহিদ মিনারে খুঁজে পায় সে। শাহেদের উক্তি, 'কিন্তু তাকে যে আজ দেখলাম শহীদ মিনারের সিঁড়িতে । সেই চোখমুখ, পরনে সেই সাদা শাড়ী, সেই চাহুনি, এতটুকু ভুল নেই।'[২৮]

৪. উপসংহার

এভাবেই আলোচনার উপাান্তে আমরা দেখতে পাই ভাষা-আন্দোলনের উপন্যাসগুলোয় লেখকগণ প্রেরণাদীপ্ত ও সংগ্রামমুখর নারীর ভূমিকাকে স্ব-প্রতিভ করেছেন। ব্যক্তি ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় ২১শে আন্দোলনরত নারীর ভূমিকায় প্রেরণাদীপ্ত হয়েছে একালের নারীরা। যার বড়ো প্রমাণ আমরা পাই অতি সম্প্রতি জুলাই বিপ্লবে নারীদের সংগ্রামমুখর অংশগ্রহণ। বাঙালির জাতীয় আন্দোলনে নারীর এই ভূমিকা কালোত্তীর্ণ হয়ে প্রভাব ফেলুক বর্তমানে ও আগামী প্রজন্মের নারীদের ওপর। এভাবে যুগের পর যুগ আগামী নারীরা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী হওয়ার আন্তরতাগিদ অনুভব করুক। প্রেরেণার আধারে থাকুক ৫২-র ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেয়া সাহসী নারীরা।

তথ্যনির্দেশ

১ Dr. Kerl Rosen Krantz, *Pdagogics as a system*, Anna Brackett (tr.), (Washingtun: P Studley Co., 1872), PP. 5-104.

২ আরজুমান আরা বেগম, *জহির রায়হানের ছোটগল্প, সমাজ বাস্তবতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি পত্রিকা, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, ১৯৯৯), পৃ. ৪০।

৩ অনীক মাহমুদ, *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৬০।

৪ জহির রায়হান, *আরেক ফাল্গুন* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশ, ২০০২), উৎসর্গপত্র।

৫ তদেব, পৃ. ১১।

৬ তদেব, পৃ. ৩৩।

৭ তদেব, পৃ. ১২।

৮ হুমায়ূন আজাদ, 'একুশের চেতনা ও তিন দশকের উপন্যাস', *বায়ান্নর একুশ: তিরিশ বছর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ৫৭।

৯ জহির রায়হান, *আরেক ফাল্গুন* , পৃ. ৬৪।

১০ সুকুমার বিশ্বাস (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন কলকাতা সংবাদপত্র*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ১২০।

১১ জহির রায়হান, আরেক ফাল্গুন, পৃ. ৬৮।

১২ জহিরুল ইসলাম, *অগ্নিসাক্ষী* (ঢাকা: হরপ্পা প্রকাশনী, ১৯৬৯), পৃ. ১৪০।

১৩ তদেব, পৃ. ১৪।

[১৪] তদেব, পৃ. ২০।
[১৫] বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬), মুখবন্ধ।
[১৬] আতোয়ার রহমান, 'কথাসাহিত্যে একুশের চেতনা', *বায়ান্নর একুশ তিরিশ বছর*, পৃ. ৪৮।
[১৭] এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৭৯।
[১৮] সেলিনা হোসেন, *যাপিত জীবন* (ঢাকা: মীর প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৬৭।
[১৯] তদেব, পৃ. ১১৪।
[২০] *তদেব*, পৃ. ১৫৭।
[২১] সেলিনা হোসেন, *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৫), পৃ. ৯১।
[২২] শওকত ওসমান, *আর্তনাদ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৬।
[২৩] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *আলো আমার আলো* (ঢাকা: মিল্লাত লাইব্রেরি, ১৯৯০), উৎসর্গপত্র।
[২৪] তদেব, পৃ. ১৬।
[২৫] তদেব, পৃ. ২৩।
[২৬] তদেব, পৃ. ২৫।
[২৭] তদেব, পৃ. ৩১।
[২৮] *তদেব*, পৃ. ৭৮।